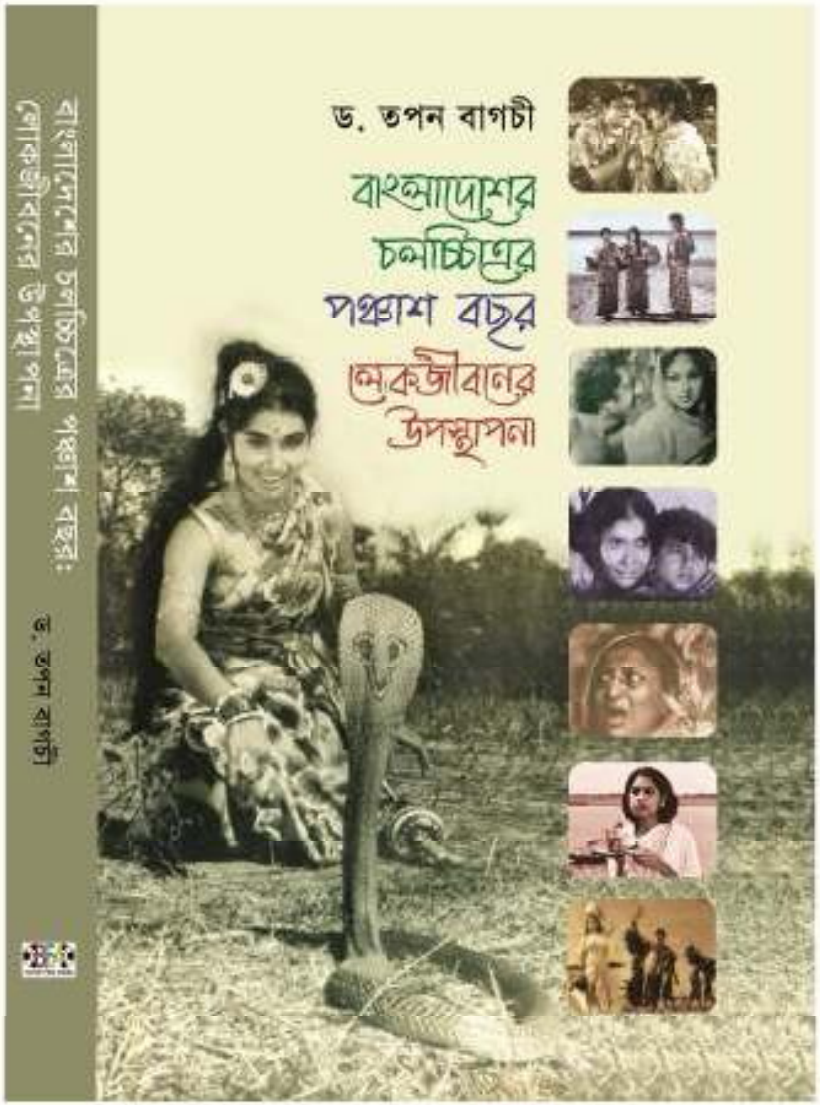
ড. তপন বাগচী
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর: লোকজীবনের উপস্থাপনা
ড. তপন বাগচী

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকজীবন

তপন বাগচী

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

ঢাকা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকজীবন
ড. তপন বাগচী

প্রকাশক
কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদশিল্পী

মুদ্রণ

উৎসর্গ

আমার চলচ্চিত্র-গবেষণার প্রথম প্রেরণা
ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের 'তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং কার্যক্রম পুনরুজ্জীবন প্রকল্প'র আওতায় 'বাংলাদেশের লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা' শীর্ষক একটি গবেষণাকর্ম তত্ত্বাবধানের সুযোগ পেয়েছিলাম। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করেন বিশিষ্ট গবেষক ড. তপন বাগচী। আমার পরামর্শ গ্রহণ করে ড. তপন বাগচী নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এই গবেষণা শেষ করেন। প্রতিটি চলচ্চিত্র বারবার দেখে লোকজ উপকরণ অনুসন্ধান করেছেন। যোগাযোগবিদ্যার ছাত্র হিসেবে তিনি আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিছুটা জানতেন। আবার লোকসংস্কৃতিচর্চায়ও তাঁর কিছুটা অবদান রয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার মিশেলে তিনি কাজটি সম্পন্ন করেন। উল্লিখিত গবেষণার পরিমার্জিত রূপ এই গ্রন্থ। চলচ্চিত্র-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন একটি দিক উন্মোচন করেছেন গবেষক, তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থটি চলচ্চিত্রবিদ্যার শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে, তা আশা করা যায়। এই ধারায় আরো গবেষণা পরিচালিত হলে, আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পের ঐতিহ্যকে ভিন্ন মাত্রায় মূল্যায়নের সুযোগ ঘটবে—এই প্রত্যাশা আমরা করতে পারি।

এই গবেষণায় পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। মূল অন্বিষ্ট বিষয়ে যাওয়ার আগে প্রথম অধ্যায়ে গবেষক চেষ্টা করেছে আমাদের চলচ্চিত্রের ধারা বিচার করতে। এটি সহায়ক হবে পাঠককে আমাদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্মিত লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের বিবরণ ও মূল্যায়নের

চেষ্টা করেছেন। আর তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচিত ৭টি চলচ্চিত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়টিই গবেষকের মূল অন্বিষ্ট।

তথ্য-সংগ্রহের ধরন এবং তথ্য-প্রকাশের সাবলীলতায় গবেষণা-গ্রন্থ হয়েও এটি কাঠখোট্টা হয়ে ওঠেনি। সাধারণ পাঠকও এতে উপকৃত হবেন বলে আমার ধারণা। আমি গবেষক তপন বাগচীকে ধন্যবাদ দিই তাঁর সৃষ্টিশীল তৎপরতার জন্য। এরকম একটি বিষয়কে গবেষণার উপযুক্ত বিবেচনা করায় এবং আমাকে তার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করায় আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের তৎকালীন মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনকে। আর সেই গবেষণা-কর্মটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি বর্তমান মহাপরিচালক কামরুন নাহারকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রকল্প পরিচালক মো. সরওয়ার আলম, উপপরিচালক মো. নিজামুল কবীলকেও আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। সকলের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি পাঠকের কাছে আদরণীয় হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

ড. সাজেদুল আউয়াল
ফ্যাকালটি মেম্বার
ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
ঢাকা

প্রবেশক

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পে বিশেষ ঢঙে কাহিনি কিংবা চিত্রনাট্য রচিত হলেও সাহিত্যের পাশাপাশি আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকগাথা ও লোককাহিনি ষাটের দশক থেকেই হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্রের বড় অবলম্বন। লোককাহিনির জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো কিংবা যাত্রার কাহিনির চিত্রায়ণের মাধ্যমে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বেশ খানিকটা প্রভাবিত হয়েছে, তা আজ অস্বীকার করার সুযোগ নেই। লোকজ কাহিনির এই প্রভাব নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা আমাদের দেশে হয়নি। চলচ্চিত্র-সমালোচনার ধারাটি অত্যন্ত দুর্বল হলেও আমাদের দেশে আলমগীর কবির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, অনুপম হায়াৎ, মুহম্মদ খসরু, মাহবুব আলম, আলী ইমাম, ড. সাজেদুল আউয়াল, তানভীর মোকাম্মেল, মির্জা তারেকুল কাদের, ড. গীতি আরা নাসরীন, ড. জাকির হোসেন রাজু, ফরিদউদ্দিন নীরদ, তারেক আহমেদ, শরাফুল ইসলাম, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, আহমাদ মাযহার, ফাহমিদুল হক প্রমুখ গবেষক বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিষয়ে তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান গ্রন্থকারে প্রকাশ করেছেন। ড. সাজেদুল আউয়াল, ড. জাকির হোসেন রাজু, ড. আমিনুল ইসলাম দুর্জয়, শেখ মাহমুদা সুলতানা প্রমুখ গবেষক প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে অনেক লেখক চলচ্চিত্র নিয়ে সমালোচনা কিংবা সংবাদ-প্রতিবেদন রচনা করেছেন।

কোনো কোনো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারে ও স্মৃতিকথায় তুলে ধরেছেন চলচ্চিত্রের গৌরবময় ইতিহাসের উপাদান ও মূল্যায়নের সূত্র। কিন্তু চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রাচীনতা ও বিশালতার বিবেচনায় আরো গবেষণা-মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের বিষয় ও শিল্পসাফল্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের চলচ্চিত্র যে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিংবা জনরুচির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করাটাও জরুরি। শক্তিশালী এই

গণমাধ্যমকে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে গেলেও বহুকৌণিক আলোচনা-সমালোচনা দরকার।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আর আগের মতো নেই, অশ্লীলতা এর মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে, অ্যাকশনের নামে কুরুচির প্রকাশ ঘটেছে– এ-ধরনের মন্তব্য আজ হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু এ থেকে উত্তরণের পথ কী, তা নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনার পরিমাণ ও পরিধি একেবারেই সীমিত। চলচ্চিত্রের মূলধারাকে সুস্থপথে চালু রাখতে না পারলেও বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আমাদের দেশে প্রসার লাভ করেছে। এটি একধরনের বড় সাফল্য হলেও মূলধারার চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াটা এক বড় ব্যর্থতা।

প্রফেসর ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী ও প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের যাত্রাগান ও জনমাধ্যম নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যাত্রাগানের সামাজিক প্রভাব নিয়ে চিন্তাভাবনা করি। লক্ষ করি যে, যাত্রাগানের অনেক জনপ্রিয় কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে। আমার নির্ধারিত গবেষণা-পরিধিতে চলচ্চিত্র নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ ছিল না। কিন্তু চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনার প্রস্তুতি ও গবেষণার পরিকল্পনা চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ 'তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং কার্যক্রম পুনরুজ্জীবন প্রকল্প'-র মাধ্যমে গবেষণা-ফেলোশিপের আয়োজন করে। আমার সৌভাগ্য যে এই প্রকল্পের আওতায় আমি গবেষণা-ফেলো হিসেবে মনোনীত হই। এই সুযোগে আমি তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন এবং মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। অনেকটা দায়িত্বের ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের উপপরিচালক মো. জসীমউদ্দিন নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশিষ্ট নাটককার ও চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ ড. সাজেদুল আউয়ালকে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁর সুযোগ্য পরামর্শ ও নির্দেশনায় আমি যথাযথভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। গবেষণা-কর্মের পরিধি ও অধ্যায় নির্ধারণে তাঁর সুবিবেচনা আমার গবেষণার গতিপথ নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহ করেও তিনি গবেষণা-কর্মটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। নিজের উদ্যোগে তিনি খোঁজখবর নিয়ে আমার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। কেবল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নন, প্রকৃত শিক্ষকের মতোই তিনি আমার প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের মুহূর্তে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই তাঁকে। তাঁর নিরন্তর প্রেরণা, তথ্যসহযোগিতা, পরামর্শ ও নির্দেশনা না পেলে এই গবেষণা কোনোক্রমেই সম্পন্ন হতো না। নানান কাজের ব্যস্ততায় গবেষণার কাজ যখন মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছিল, তখন ড. সাজেদুল আউয়াল সাহস দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে , প্রয়োজনীয় ধমক দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। আমার চলচ্চিত্র-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকে আমি গুরু বলে মান্য করি। তাঁর প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা।

গবেষণার বিভিন্ন পর্বে আমি পরামর্শ গ্রহণ করেছি চলচ্চিত্র-গবেষক অনুপম হায়াৎ-এর। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের তৎকালীন সচিব টাইগার জাম্বিল, পরিদর্শক বিবেকানন্দ রায়, প্রকাশক-গবেষক সিকদার আবুল বাশার, প্রাবন্ধিক সত্যপ্রকাশ মিত্র, সাংবাদিক আপেল মাহমুদ প্রমুখের সহযোগিতার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

চলচ্চিত্র দর্শনের সময়ে আমার সঙ্গে উপস্থিত থেকে অংশ নিয়েছেন আত্মজ তূণীর বাগচী, দ্বিতীয়া বাগচী, আমার স্ত্রী কেয়া বালা ও শ্যালক দেবপ্রিয় বালা। তাঁদের উৎসাহ আমার গবেষণার সময়টুকু আনন্দঘন হয়েছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ঊর্ধ্বে।

চলচ্চিত্রের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কেসস্টাডি তৈরি করা বেশ জটিল কাজ। সংলাপ কিংবা গানের বাণীর উদ্ধৃতি নির্ভুল করা বেশ কষ্টকর। তবু বারবার শুনে চেষ্টা করেছি নির্ভুল করতে।

চলচ্চিত্র গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিক এই উদ্যোগ প্রবহমান থাকলে, আরো অনেক বিষয়ভিত্তিক গবেষণা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হবে। এই গবেষণাটি অনেকখানি মূল্যায়নধর্মী। এখান থেকে আমাদের চলচ্চিত্রের গৌরবজনক একটি অধ্যায়ের কিছু তথ্য আর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানা যাবে।

গ্রন্থটির প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের বর্তমান মহাপরিচালক কামরুন নাহার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকল্প পরিচালক মো. সরওয়ার আলমকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থাগারিক জনাব নজরুল ইসলামসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। গ্রন্থটি পাঠকের ভালবাসা পেলে এই শ্রম সার্থক মনে করব।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা

প্রকাশকের কথা

প্রবেশক

সার-সংক্ষেপ

সূচনা ও পটভূমি

গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিষয়ভিত্তিক ধারাবিচার

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র : একটি বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত চলচ্চিত্রে লোকজীবন উপস্থাপনা

উপসংহার

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

সার-সংক্ষেপ

চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয় মানুষের জীবন, জীবনযাত্রার ধরন। আধুনিক ও চলমান জীবনযাত্রা যেমন উঠে আসে চলচ্চিত্রে, তেমনি ঐতিহাসিক কিংবা কাল্পনিক কাহিনি নিয়েও নির্মিত হতে পারে উৎকৃষ্ট মানের চলচ্চিত্র। কাহিনিবিন্যাসের কুশলতা, সংলাপ রচনার সৃজনশীলতা, পরিচালনার দক্ষতা, অভিনয়ের কৃতিত্বসহ নানান আনুষঙ্গিক আয়োজনে একটি চলচ্চিত্র মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারে। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আমাদের লোকসংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে লোকশিক্ষার বাহন হয়ে রয়েছে। এই লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান লোকগাথা কিংবা লোককাহিনির (Folk-Tale) চলচ্চিত্রায়ণের মাধ্যমে গণমানুষের শিক্ষা ও বিনোদনের অবলম্বন হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আমাদের চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা কমবেশি হলেও তাতে লোকজীবনের উপস্থাপনা কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে তেমন আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে না। কেবল লোককাহিনি নয়, সাধারণ চলচ্চিত্রেও রয়েছে লোকজীবনের উপস্থাপনা যা বাঙালির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যেরই বিশ্বস্ত দলিল।

বিশিষ্ট পরিচালক সালাহ্উদ্দিন (১৯২৬-২০০৩) চলচ্চিত্রের জন্যে লোককাহিনিকে প্রথম বিবেচনা করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁর 'রূপবান'[১]

১ 'রূপবান' নামটি প্রচলিত ও গৃহীত হলেও এটি 'রূপভান'-এত্ম অপভ্রংশ বলে ধারণা করা হয়। রূপবান শব্দটি পুরুষবাচক, তাই নারীচরিত্রের নাম রূপবান না হয়ে রূপবতী হওয়ার কথা ছিল। লোকসংস্কৃতিবিদ প্রফেসর আবুল আহসান চৌধুরী অনুমান করেছেন মালকাবানু, পরীবানু প্রভৃতি নামের মতো এটি রূপবানু ছিল। তার অপভ্রংশ হিসেবে রুপবান শব্দটি প্রচলিত হয়ে উঠেছে।

চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯৫৫ সালে 'মহুয়া' পালার চিত্রায়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়। মহুয়া-চরিত্রে রানী সরকারকে বিবেচনা করে সামিরা স্টুডিওর মালিক জনাব আলী এই চলচ্চিত্রের প্রযোজনায় এগিয়ে আসেন। তিনি চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শেখ লতিফ (জ. ১৯৩২) যুক্ত ছিলেন এর প্রোডাকশনের সঙ্গে।[২] কিন্তু এ চলচ্চিত্র আর মুক্তি পায়নি। লোককাহিনিকে কিংবা যাত্রার কাহিনিকে চলচ্চিত্রায়ণের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা বলে ধরে নেয়া যায়।

ষাটের দশকে যাত্রাপালা হিসেবে 'রূপবান' পালাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় এই কাহিনির চিত্রায়ণ-সাফল্য অনেক চিত্রনির্মাতাকে উর্দুভাষার বদলে লোকগাথাভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রেরণা দেয়। রূপবান লোককাহিনির সাফল্যের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের যেন হিড়িক পড়ে যায়। এবছর মুক্তিপ্রাপ্ত ২৫টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ১০টি চলচ্চিত্রের (৪০%) কাহিনিবিন্যাসই লোকজ অনুষঙ্গে পূর্ণ।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোককাহিনির প্রভাব যথেষ্ট তাৎপর্যময়। উর্দু চলচ্চিত্রের আধিক্যের কালে লোককাহিনির চিত্রায়ণ এবং বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধির কারণ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, 'রূপবান' যাত্রার আগমন আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পকে চারভাবে প্রভাবিত করেছে—

১. লোক-ঐতিহ্যের দিকে অর্থাৎ শেকড়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছে।
২. যাত্রার জনপ্রিয় কাহিনিকে চিত্রায়ণের মাধ্যমে সাধারণ দর্শককে হলমুখী করতে সহায়তা করেছে।
৩. বাংলা চলচ্চিত্রের বাজার বৃদ্ধি করেছে।
৪. উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে বাঙালি পরিচালকদের নিরুৎসাহিত করেছে।

২ অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, বিএফডিসি, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮

১৯৬৭ সালে 'রহিম বাদশা ও রূপবান'-এর পরিচালক সফদার আলী ভুঁইয়া 'ঝুমুর যাত্রা'র জনপ্রিয় পালা 'কাঞ্চনমালা'র কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপ দেন। 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল'-কে চলচ্চিত্রায়িত করেন পরিচালক আজিজুর রহমান (জ. ১৯৩৯)। ১৯৬৮ সালে আজিজুর রহমান নির্মাণ করেন ঝুমুরযাত্রার নন্দিত পালা 'মধুমালা' এবং ইবনে মিজান নির্মাণ করেন 'রাখালবন্ধু'। এবছর রূপবানের কাহিনি নিয়ে নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পরিচালক ই. আর. খান 'রূপবানের রূপকথা' নামে। ১৯৬৯ সালে ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনিভিত্তিক 'বেদের মেয়ে' ও 'মলুয়া' চিত্রায়িত হয়। 'রূপবান'-খ্যাত পরিচালক সালাহ্উদ্দিন চলচ্চিত্রে রূপ দেন 'আলোমতি প্রেমকুমার' যাত্রাপালার কাহিনিকে।

পরিচালক ইবনে মিজান 'আমীর সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী' নির্মাণ করেন ১৯৭০ সালে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সঙ্গত কারণেই বেশি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়নি। ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'নিমাই সন্ন্যাসী' ও 'লালন ফকির' চলচ্চিত্রের কাহিনি যাত্রা-অপেরার মাধ্যমে সারাদেশে আগেই জনপ্রিয় ছিল। এদুটি চলচ্চিত্রের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে সিরাজুল ইসলাম (জ. ১৯৩৮) ও সৈয়দ হাসান ইমাম (জ. ১৯৩৫)। ১৯৭৬ সালে লোককাহিনি 'কাজলরেখা' চিত্রায়িত করেন সফদার আলী ভুঁইয়া। এবছর চলচ্চিত্রশিল্পে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয়। মোহাম্মদ আলী মিন্টুর পরিচালনায় 'বর্গী এলো দেশে' যাত্রাপালার হুবহু চলচ্চিত্রের রূপ দেয়া হয়। ১৯৭৭ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় 'সাগর-ভাসা' নামের একটি লোককাহিনির চিত্ররূপ। ১৯৮৪ সালে সফদার আলী ভূঁইয়া নির্মাণ করেন 'রসের বাইদানী' (১৯৮৪)। এটি জনপ্রিয় কাহিনি 'বেদের মেয়ে'র প্রভাবজাত।

১৯৮৫ সালের ৬৫টি চলচ্চিত্রের মধ্যে আজিজু রহমানের 'রঙিন রূপবান', মতিন রহমানের (জ. ১৯৫২) 'রাধাকৃষ্ণ', মহম্মদ হাননানের (জ. ১৯৪৯) 'রাই বিনোদিনী' এবং হারুনুর রশীদের (জ. ১৯৪০) 'গুনাইবিবি' ছিল লোককাহিনি থেকে নেয়া। ১৯৮৬ সালে ৪টি, ১৯৮৭ সালে ৩টি, ১৯৮৮ সালে ২টি, ১৯৮৯ সালে ৬টি, ১৯৯০ সালে ১টি, ১৯৯১ সালে ৩টি এবং ১৯৯২ সালে ১টি চলচ্চিত্রের মধ্যে লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৮৯ সাল বাংলাদেশের

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তোজাম্মেল হক বকুল পরিচালিত, মতিউর রহমান পানু (জ. ১৯৪০) প্রযোজিত এবং অঞ্জু ঘোষ (জ. ১৯৬৬) অভিনীত 'বেদের মেয়ে জোসনা' চলচ্চিত্রটি এই গুরুত্বের প্রধান কারণ।

লোকজ কাহিনির চলচ্চিত্রায়ণ নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক ব্যাপার। প্রতিটি দেশের সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির গভীর সংযোগ রয়েছে। আশার কথা এই যে, চলচ্চিত্র শুরুর পর্বে লোকনাট্য এবং যাত্রার কাছ থেকে অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতি থেকেই উপাদান গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে। কিন্তু বর্তমানে চলচ্চিত্রশিল্পে হিন্দি চলচ্চিত্রের ফর্মুলা নকল করার প্রতিযোগিতা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে পড়েছে। দর্শকরা দেশি চলচ্চিত্র দেখতে এখন আর সিনেমা-হলে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় না। যে যাত্রা বা লোককাহিনি আমাদের দেশ থেকে আসল উর্দু চলচ্চিত্র হটিয়ে দিয়েছে, সেই যাত্রা বা লোককাহিনি নকল হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রভাব তাড়িয়ে সুস্থ ও স্বকীয় ধারা পুনর্নির্মাণ করতে পারে। এ নিয়ে তাই প্রণালিবদ্ধ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় জনমানসে লোককাহিনির প্রভাব কতটা রয়েছে, তা-ও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। আরো বিস্তৃত পরিসরে এই গবেষণা হলে, জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের ধারণা।

গবেষণার সুবিধার জন্য আমরা ৭টি চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছি যেগুলো লোককাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। এগুলো হলো সালাহ্উদ্দিনের 'রূপবান', জহির রায়হানের 'বেহুলা', ইবনে মিজানের 'রাখালবন্ধু', দীলিপ সোমের 'সাতভাই চম্পা', সফদর আলী ভূঁইয়ার 'কাজলরেখা', হারুনর রশীদের 'গুনাইবিবি' এবং তোজাম্মেল হক বকুলের 'বেদের মেয়ে জোসনা'।

'রূপবান' গ্রামবাংলার প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোককাহিনি থেকে নির্মিত চলচ্চিত্র। রূপবান কাহিনিতে লোকাচার ও লোকঅনুষ্ঠান হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান, বাসররাত, লোকবিশ্বাস প্রভৃতি। লোকসুরের আধিক্য এবং দ্বন্দ্বমুখর কাহিনির কারণে 'রূপবান' বাঙালির লোকজীবনের চিরায়ত রূপরেখা হয়ে উঠেছে। 'বেহুলা' চলচ্চিত্র

চিরায়ত পৌরাণিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। পৌরাণিক কাহিনির চিত্রায়ণকে আমরা লোকজ জীবনের চিত্রায়ণ বলে বিবেচনা করতে পারি। বেহুলার কাহিনি সনাতন জীবনধারায় নিবিড়ভাবে মিশে আছে। 'রাখালবন্ধু' কাহিনিতে লোকসঙ্গীতের প্রয়োগের মাধ্যমে এই কাহিনিকে লোকজীবনঘনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। রাখালবন্ধু চলচ্চিত্র ফোকফ্যান্টাসিতে পূর্ণ। গ্রামের পরিবেশ, নদীতীর, গরুচরানোর মাঠ, নৌকাবিলাস, পালকিযাত্রা সবকিছু মিলিয়ে লোকজ আবহ সৃষ্টির চেষ্টা রয়েছে। 'সাতভাই চম্পা' চলচ্চিত্রে লোকজীবনের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। রানীদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে ছয় ছেলে ও এক মেয়ে ফিরে পাওয়ার কাহিনির মধ্য দিয়ে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে। রূপকথার কাহিনি 'কাজলরেখা'য় লোকশিক্ষার কিছু উপাদান থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা যায়। 'গুনাইবিবির পালা' জনপ্রিয় কাহিনির পুর্নবিন্যস্ত চিত্ররূপ। চিত্রায়ণের প্রয়োজনে মূলকাহিনির কিছু বিচ্যুতি ঘটলেও তাতে প্রকৃত রস ও সুর নষ্ট হয়নি। এতে রূপায়িত প্রতিটি দৃশ্যই লোকজীবন থেকে নেয়া। লোকগাথার রূপায়ণের কারণে 'গুনাইবিবি' জনমনে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। 'বেদের মেয়ে জোসনা'র জনপ্রিয়তার পেছনেও হয়তো বাঙালি দর্শকের ঐতিহ্যপ্রীতি ক্রিয়াশীল। সর্পবিশ্বাসও এই অঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। লোকজ গানের সুর ও শারীরিক কসরত ও সর্বোপরি লোকজ জীবনের চিত্রায়ণই এই চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ার কারণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে লোকসংগীত। বাঙালির প্রাণের এই সম্পদ লালন ও প্রচার করার ক্ষেত্রে আলোচিত চলচ্চিত্রগুলোর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকজীবনের সন্ধান করতে লোককাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রের কাছে বারবার ফিরে যেতে হয়। লোকজীবনের অকৃত্রিম উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের চলচ্চিত্রের নির্মাতারা যে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা যায়।

গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি

এই ধরনের গবেষণা গুণাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিমাণাত্মক ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা গবেষক করেছেন, তাঁরা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা থেকে পর্যালোচনা করে লোকজ উপদানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্বাচন করা হয়েছে। সেখান থেকে নির্বাচিত চলচ্চিত্রসমূহ বারবার দর্শন করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়। সময়ের সীমাবদ্ধতা ও অবস্থার বাস্তবতা বিবেচনা করে এই গবেষণায় প্রধানত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হলো–

ক. সাহিত্য পর্যালোচনা পদ্ধতি

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ-প্রবন্ধ-প্রতিবেদন সংগ্রহ, পাঠ ও বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা এবং জাতীয় পত্রিকার চলচ্চিত্র বিষয়ক পৃষ্ঠার প্রতিও বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

খ. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

ফিল্ম আর্কাইভে রক্ষিত ও সিডিতে প্রাপ্ত চলচ্চিত্র থেকে বাংলাদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের তালিকা ও অন্যান্য উৎস থেকে লোকজ কাহিনি-নির্ভর চলচ্চিত্রের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকা থেকে ২৫টি চলচ্চিত্র দর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে লোককাহিনিভিত্তিক ৭টি